উনিশ শতকে ভারতীয় নারী: সমাজ, সংস্কার ও উপনিবেশ

ড. অবিনাশ সেনগুপ্ত

সারসংক্ষেপ: ১৯ শতকে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা পরিবর্তনের চেষ্টাকে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ করলে প্রগতিশীল শক্তির সংগে বহু প্রতিক্রিয়াশীল ধারনার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম ছিলেন ভারতীয় নারী। ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষকে শাসন করার ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এদেশের নারীর দুর্দশা ও হতাশাজনক অবস্থাকে তুলে ধরত। ঔপনিবেশিক ভারতে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল ছিল। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় ঐতিহ্য নারীকে সর্বদাই অবনমিত করে রাখত এবং সমস্ত বিষয়ে পুরুষের অধীনস্ত থাকতে বাধ্য করত। তাই অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার কারনে নারী তার স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। সংস্কারকদেরও নারীকে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করতে এবং নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল। প্রগতিশীল সভ্যতার প্রতিনিধি ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতীয় নারীর মুক্তির জন্য যথেষ্ট ভেবেছিলেন তবে তারাও সংস্কার বিরোধীদের পুরোপুরি বিরুদ্ধতা করতে পারেননি। নারীকে সর্বদাই পাশ্চাত্য চেতনা থেকে মুক্ত করে রাখার চেষ্টা চলত। কারন এদেশের আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব ছিল একা নারীর। আশা করা হতো ভারতীয় নারী তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলবে। ঔপনিবেশিক নারী ছিলেন ধর্ম ও পুরুষ দ্বারা নিপীড়িত।

মূল শব্দগুচ্ছ: ভারতীয় নারী, সংস্কারক, সমাজ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঔপনিবেশিক।

যে কোনো সমাজে মহিলাদের স্বাধীনভাবে বিকাশের উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং তার মর্যাদা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমান অধিকার লাভের সুযোগের মাধ্যমে সেই দেশে নারীর অবস্থান নির্নয় সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নারীর অবস্থান নির্নয়ে দেখা যায় যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী সর্বদা সামান্য স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা সর্বদাই নীচে অবস্থান করে।এবং সমাজে পরিগনিত হয় দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসাবে। উন্নত বিশ্বেও মহিলাদের সামাজিক অবস্থান কে তুলে ধরার চেষ্টা হয়১৮ ও১৯ শতকে। এই সময় নারীত্বের নতুন সংজ্ঞা নিরূপিত হতে

থাকে। শুধু লিঙ্গের কারনে তাদের নীচে দেখানো হতনা। তবে মহিলাদের প্রতি আচরনের পরিবর্তনটা বাস্তব জীবনে তৎক্ষনাৎ হয়ে ওঠেনি। উনিশ শতক নারীর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের জন্য বিশেষ ভাবে স্মরনীয়।

পার্থ চ্যাটার্জ্জী মনে করেন, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দুটি পরস্পর বিরোধী চাহিদাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেগুলি হলো বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য সভ্যতা সবচেয়ে শক্তিশালি এই ধারনাটি ছিল বস্তুগত পরিধির ধারনা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আধুনিক হস্তশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি ইউরোপিও দেশগুলি দ্বারা অ-ইউরোপিও দেশগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল। এবং সমস্ত বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। এই আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য উপনিবেশের মানুষরা উন্নত কলা কৌশল শিখেছিল নিজেদের বস্তুগত জীবনকে সংগঠিত করতে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে সেগুলিকে ঢুকিয়ে দিতে। এটা ছিল জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের দৃষ্টিভঙ্গির একটা দিক যেটিকে তাদের সনাতন সংস্কৃতির সংস্কার সাধন ও উন্নতিকরনের একটা চেষ্টা হিসাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমী সংস্কৃতি প্রবেশ করবে এবং এর ফলে পশ্চিম ও প্রাচ্যের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য গুলো বিলুপ্ত হবে। কারন এর ফলে জাতীয় সংস্কৃতির আত্মপরিচয় একটা সংকটের মধ্যে পড়বে। আসলে ১৯ শতকের জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন যে জীবনের সবক্ষেত্রে পশ্চিমের অনুকরন শুধু অ-প্রয়োজনীয়ই নয় বরং এটা অবাঞ্ছিত কারন আধ্যাত্মিক জগতে প্রাচ্য পশ্চিম অপেক্ষা উচ্চে অবস্থান করছে।**(১)**

বস্তুগত ক্ষেত্রে পশ্চিমকে গ্রহন করা যেতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে নিজস্ব প্রাচ্য সংস্কৃতি, দেশীয় বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করবে এবং পশ্চিমের সঙ্গে একে মিশতে দেবেনা। এই বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রটিকে আবার ভিতর ও বাহির দু প্রকারে ভাগ করা যায়। বস্তুগত ক্ষেত্রটি অনেকটাই বাইরের জিনিষ কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রটি ছিল আবশ্যক। বাস্তবিক ভাবে বলা যায় যে এটা ছিল ঘর ও বাহির। ফলে এই ঘরের কৌলিন্য রক্ষার্থেই ১৯ শতকে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করা হতো পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে। ঔপনিবেশিক শাসক অর্থাৎ ইউরোপিও শক্তি সর্বদাই অ-ইউরোপিওদের চ্যালেঞ্জ জানাত তাদের বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতির দ্বারা। কিন্ত ইউরোপিও শাসকরা ব্যর্থ হয়েছিল ‘ভিতরে‘ প্রবেশ করতে যেটা দেশীয়দের একেবারে নিজস্ব ছিল। নারী ছিল এই ‘ভিতর‘ এর আবশ্যক এক পরিচিতি।**(২)**

ভারতে ১৮ শতক থেকেই নারীর অবস্থান নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। ১৯ শতকের প্রারম্ভেই সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যা অনেকটা পরিস্কার আকার ধারন করে। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনাধীন সমাজকে

মেয়েলিপনায় ভরা ও পৌরষত্বের বিরোধী বলে মনে করা হত। এবং এই পৌরষহীন চরিত্রকেই এই দেশের স্বাধীনতা হারানোর কারন বলে মনে করা হত।(৩) ঔপনিবেশিক সমালোচকরা এই দেশের ঐতিহ্য কে অসভ্য ও অধঃপতিত হিসাবে চিহ্নিত করতে ভারতীয় মহিলাদের ওপর পুরুষদের দ্বারা নৃশংসতার ও অত্যাচারের একটি দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরত। (৪) তারা মনে করত এই দেশের মহিলাদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার জন্যই পৃথিবীর উচ্চ সভ্যতা গুলির তুলনায় ভারতের স্থান নীচে অবস্থান করছে। (৫)

ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক রহস্য ছিল। যেমন সতী প্রথার নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে কিছুটা ধারনা ছিল। ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানবার জন্য নতুন উদ্যম গ্রহন করল। এই সময় প্রাচ্যবাদীরা ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় অতীতকে উন্মোচিত করেন।এছাড়া তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা। উইলিয়াম জোন্সের পূর্বেই ওয়ারেন হেষ্টিংস এই দৃঙ্গিভঙ্গি গ্রহন করেছিলেন। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক প্রয়োজনে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরন করা।ব্রিটিশরা ভারতীয়দের তাদের নিজেদের আইন দ্বারা শাসন করতে চেয়েছিল।(৬) এবং তারা এদেশের পারিবারিক আইনে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে চায়নি।তাদের ধারনা ছিল যে ব্রিটিশ আইন ভারতীয়দের উপর জোর করে চাপালে তার ফল ভাল হবেনা। তবে ক্রমশ ভারতে বাজার তৈরির চাপ কোম্পানির প্রথমের দিকের প্রাচ্যবাদী মতাদর্শ কে চ্যালেঞ্জ জানায় ও ভারতীয় সমাজের এক বৃহৎ পাশ্চাত্যকরণের দাবী জানায়।

এই সময় খ্রীস্টান মিশনারীরা এ দেশের হিন্দু ধর্মের অর্থহীন প্রথার সমালোচনা করেন ও বিভিন্ন খারাপ প্রথা গুলিকে আক্রমণ করেন। তারা ভারতে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করা শুরু করেন।তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের সভ্য করে তোলা। এছাড়া জেমস মিলের মতো উপযোগীবাদীরা মনে করতেন যে ভারতীয় মহিলারা ধর্ম ও পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত। এবং মহিলাদের নিচে অবস্থানের মূল নিহিত আছে ধর্মের মধ্যেই। এবিষয়ে ভারতে ১৯ শতকে একজন বিদেশী পর্যটকের বিবরনের প্রতি নজর দেওয়া যেতে পারে।তিনি লিখেছেন-জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, সমাজের কোনো অবস্থায়, মহিলারা নিজের ইচ্ছে মতো কিছুই করতে পারেনা। তাদের পিতা, স্বামী, পুত্রেরাই ছিল রক্ষাকারী, কিন্তু একেই কি বলে রক্ষা। দিন রাত্রি মহিলারা এই রক্ষাকারীদের কাছে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। মহিলাদের

স্বাধীনতার যোগ্য মনে করা হতনা। মহিলারা বিছানা, চেয়ার আসবাব গহনা নিয়েই খুশি থাকবে, কিন্তু তাদের স্বামীর মধ্যে থাকত সমস্ত ভাল গুনাবলি।(৭)

ঔপনিবেশিক সরকারও ভারতবর্ষের অনগ্রসরতার জন্য মহিলাদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থাকে দায়ী করেন। এদেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের মতাদর্শগত ন্যায্যতার একটি কেন্দ্রীয় উপাদান ছিল অরাজকতা, অনাচার ও অধঃপতিত দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা। ফলে ইংরেজরা এদেশে ব্রিটিশ শাসনের গ্রহন যোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ উপনিবেশবাদ এই সময় নিজেকে দেখেছে একটি সিভিলাইজিং মিশন হিসাবে। যারা একটি সুশৃখল, বৈধ ও ন্যায়বাদী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে ও ভারতীয়দের অন্ধকার বর্বরতা থেকে উদ্ধার করে সভ্যতার আলো দেখাবে।এই সময় খ্রীস্টান ও উপযোগবাদীরা যেমন ভারতবর্ষের সমসাময়িক অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে চোখ খুলে দিয়েছে ঠিক অন্যভাবে প্রাচ্যবাদীরা ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা ও প্রাচীনকালে মহিলাদের উন্নত অবস্থার, মর্যাদার ও স্বাধীনতার কথা মনে করালেন। যদিও প্রাচীনকালে ভারতীয় নারীর অবস্থা খুব ভালো ছিল এমন বক্তব্য সোজাভাবে মেনে নেওয়া কঠিন। রোমিলা থাপার বলেছেন যে, নারীদের মর্যাদা সবসময় একরকম ছিলনা।কখনো তাদের হাতে কর্তৃত্ব ছিল এবং তারা স্বাধীনতা ভোগ করতেন আবার কখনো দেখা গেছে তারা পরাধীনভাবে দিন কাটাচ্ছেন।(৮)

ভারতীয় সংস্কারকরাও বিভিন্ন কু প্রথাগুলিকে পরিত্যাগ করে মহিলাদের অবস্থান কে দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকে বুদ্ধিজীবি, সমাজ সংস্কারক, প্রশাসক, সাহিত্যিক সকলেই ভারতীয় সমাজে মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সমাজে প্রচলিত পুরানো নিষ্ঠুর নিয়ম, নীতি, প্রথাগুলি থেকে মহিলাদের মুক্তির প্রশ্নটি ছিল ১৯ শতকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি নারীকেন্দ্রীক বিষয় গুলি নিয়ে ১৯ শতকে মহিলাদের মর্যাদা ও অবস্থানের পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিকভাবে বেঠিক বিষয়গুলির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তির সমর্থনের ইঙ্গিত যেমন মেলে, তেমনি অন্যদিকে সমস্ত সুত্রগুলোকে খুব ঘনিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করলে নারী মুক্তির বিষয়ে বহু প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার প্রভাবের কথাও জানা যায়।

সংস্কারকরা মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন, ফলে ইংরেজ প্রশাসনে কাছে এটা চিন্তার কারন হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা ছিলেন প্রগতিশীল সভ্যতার প্রতিনিধি। অন্যদিকে তারা আবার সংস্কার বিরোধীদের বিরূদ্ধেও পুরোপুরি যতে পারেননি। কারন তার উপর ভারতে ইংরেজ আধিপত্য রক্ষার বিষয়টি নির্ভর করত। তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসন এদেশবাসীকে সভ্য করে তোলার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেন যার

সাথে যুক্ত ছিল উপযোগিতাবাদী আদর্শ। ঔপনিবেশিকরা মনে করতেন ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। শাস্ত্রগ্রন্থ গুলিতে ধর্মের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং দেশীয় সমাজ সেই শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতেন। এবং বহু দেশীয় পন্ডিত নিজ স্বার্থে সেই শাস্ত্রের ভূল ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। কারণ সাধারণ মানুষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশদ বুঝতেন না। সেজন্য নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নারীকে অবদমিত রাখা হতো।এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার সেই শাস্ত্রের সত্য কে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন।শাস্ত্রের বাইরে যাবার সাধ্য না ছিল ঔপনিবেশিকদের আর না ছিল ভারতীয় সংস্কারকদের। শাস্ত্রই ছিল মূল। নারীর ইচ্ছা অ-নিচ্ছা সেখানে কোনো মূল্য পায়নি।**(৯)** ১৯ শতকে নারীকে বিভিন্ন প্রথা থেকে মুক্ত করার যে চেষ্টা সেটি ছিল সমাজকে উচ্চে তুলে ধরার চেষ্টা। ভারতীয়দের মূল ঝোঁক ছিল সমাজের প্রতি, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা ব্যাক্তির দিকে নয়। এর লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক শান্তিরক্ষা ও সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন।**(১০)** সমাজে পুরুষরা মহিলাদের উপর জোর খাটাত বিভিন্ন প্রথাকে মেনে নেবার জন্য। সতীপ্রথা, বাল্য বিবাহ, নিরক্ষরতা ইত্যাদি চিরাচরিত প্রথাগুলি বিষয়ে পুরুষ সর্বদাই সমাজে আধিপত্য বজায় রাখত। ব্রিটিশদের ভারতে আগমনের সময় সতীদাহ প্রথা ছিল এদেশের হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির একটি অন্যতম অঙ্গ।ইউরোপিও পযরটকদের বিবরণে এই প্রথা ছিল বর্বর ও মহিলাদের প্রতি সমাজের চূড়ান্ত নিষ্ঠুর আচরন।তারা এর নিন্দা করেন।বেন্টিক সতীপ্রথা রদ করেন। এর অন্যতম বাস্তব কারন ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের সমালোচনা করা এবং ভারতীয়দের সভ্য করে তোলা।সেজন্য আইন রূপায়নের প্রয়োজন বলে তারা মনে করতেন। ব্রিটিশরা বিশ্বাস করতেন যে, শেষ পর্যন্ত ভারতীয়রা নিজেরাই উপলব্ধি করবেন যে তাদের এই রীতি নীতি গুলি মূল্যহীন। লতা মনি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এটা ছিল ঔপনিবেশিক বক্তৃতা বা উপদেশ যা ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় গ্রন্থের কর্তৃত্বকে মেনে নেওয়া এবং যা ছিল সমস্ত হিন্দু গ্রন্থের প্রতি আত্মসমর্থন। সতীদাহকে সংস্কার করা হয় ঐ সমস্ত গ্রন্থের নির্দেশের মাধ্যমে। লতা মনির মতে, সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত বলে মনে করা হত, তাই ব্রিটিশরা এটা রদ করার ক্ষেত্রে জনবিক্ষোভের ভয় পেত।একদিকে তারা এটা রদ করতে চায় অন্যদিকে তারা উপনিবেশের সমাজে নাক গলাতেও অনেকটা অনিচ্ছুক।তৎকালিন নিম্ন প্রদেশের পুলিশ সুপারিন্টেন্ড **Walter Ewer** বলেছেন যে, সতীদাহ প্রথাকে ধর্মীয়, স্বেচ্ছাকৃত ও আধ্যাত্মিক বলে ঘোষনা করা হলেও এটা অন্যদিকে ছিল সতীর আত্মীয়দের বিধবার সম্পত্তি লাভের ও একটা উদ্দেশ্য।**(১১) Walter Ewer** এর মতে সতীদাহ প্রথার একটা কারন হলো শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অথবা বলা যায় এটা ছিল পুরোহিত ও আত্মীয়দের সচেতনভাবে করা

একটা কৌশল। এবং খুব সচেতন ভাবেই হিন্দুরা এটাকে ধর্মীয় বলে চালিয়েছেন। কারণ ধর্মীয় পদক্ষেপ জনগন দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহন করবে। বহু বিধবা নারী পুরোহিত ও আত্মীয়দের চক্রান্তের শিকার।এরা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে কলুষিত করেছেন। **Ewer** বলেছেন যে, 'মনু' তে কোথাও সতীর কথা উল্লেখ নেই। বরং মর্যাদাপূর্ন বৈধব্য জীবনের কথা আছে।**(১২)**

বহু প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে নিষ্ঠুর ও বর্বর এই সতীপ্রথার বিবরন মেলে। এরকমই এ এই সতীপ্রথা রদের ২ বছর আগে ১৮২৭ সালে লেখা হয়- "She soon leaped from the flame, and was seized, taken up by the hands and feet, and again thrown upon it, much burnt; she again sprung grom the pile, and running to a well hard by, laid herself down in the water course, weeping bitterly.....At length, on her uncle swearing by the Ganges, that if she would seat herself on the cloth (which he had provided) he would carry her home, she did so, was bound up in it, carried to the pile now fiercely burning and again thrown in to the flames."**(১৩)**

সতী নিয়ে রামমোহনের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে।১৮১৮ থেকে ১৮৩২ পর্যন্ত রামমোহন সতী বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি করেন। তবে লতা মনির মতে, রামমোহন তার লেখালেখিতে শাস্ত্রকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন ততটা গুরুত্ব তিনি সতীর নিষ্ঠুর ভাবে পুড়ে মরার প্রতি দেননি।**(১৪)** তবে বলা হয় যে, রামমোহনের প্রথম দিককার কিছু লেখা-পত্রে অত্যাচারিত ভারতীয় মহিলাদের অবস্থা ও মর্যাদার উন্নতির জন্য মানবিক আবেদন ও প্রকাশ পেয়েছিল।**(১৫)** তবে সতীদাহ রদের সময় রামমোহন দেশীয় সমাজ ও ইংরেজ শাসকদের কাছে যুক্তি হিসাবে মানবিক আবেদনের চেয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন। বিধবাকে জোর করে মৃত স্বামীর চিতায় নিক্ষেপ শাস্ত্র বিরোধী বলে রামমোহন মনে করতেন। তার প্রশ্ন ছিল আদৌ মহিলাদের বাধ্য করার কোনো মৌলিক অধিকার সমাজের আছে কিনা। রামমোহন মনু র কথা বলেন।সংস্কার বিরোধীরা আবার মনু র গ্রহণ যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই পক্ষ ও বিপক্ষে যে যুক্তি তর্ক চলেছিল এখানে নারীকে ব্যাক্তি হিসাবে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এবং এই আলোচনায় নারীর মতামত ও নেওয়া হয়নি।অথচ কোন ঐতিহ্যটি থাকবে বা কোনটি পরিবতির্ত হবে তার কেন্দ্রে ছিলেন নারী। মূল আলোচ্য ছিল ঐতিহ্যের প্রতি

মহিলার প্রতি নয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছিলেন একজন উদার সংস্কারক যিনি বিধবা নারীকে পুড়িয়ে মারার বিরোধিতা করেছিলেন। বরং তিনি উচ্চধর্মী হিন্দু নারীর মর্যাদাপূর্ন বৈধব্য জীবন কাটানোর উপর মতামত দেন। তিনি উদাহরন দিয়ে দেখান যে শাস্ত্রে কোথাও নারীর মর্যাদাপুর্ন বৈধব্য জীবনের জন্য কোনো রকম নিষেধ নেই।**(১৬)**

পশ্চিমিদের প্রথম দিকে ধারনা ছিল যে সতীরা স্বেচ্ছায় সতী হতেন। বহু ইউরোপীয় সাহিত্যিক সতীকে তাদের সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। ১৯ শতকে সতী ব্রিটিশ উপন্যাস, সাময়িক পত্রে একটি মেটাফোর রূপে ব্যবহৃত হত। ব্রিটিশ দম্পতির নিকট এটাকে দৃস্টান্ত রূপেও দেখানো হত। ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংস্কৃতির পার্থক্যটাও বোঝানো হত। এছাড়া ব্রিটেনের মহিলাদের কাছে এটা ত্যাগের দৃষ্টান্ত রূপেও তুলে ধরা হত।একদিকে দেখানো হত এটা একটি নিষ্ঠুর বর্বর প্রথা এবং অন্যদিকে এটাকে স্বেচ্ছায় গ্রহনীয় একজন নারীর স্বামীর প্রতি ভালবাসা, সাহস ও আদর্শের দৃষ্টান্ত রূপেও ভাবা হত।**(১৭)**

Sophie Gilmartin তার প্রবন্ধে সতী সম্পর্কে ব্রিটিশদের মনোভাবের মধ্যে একটা পরস্পর বিরোধীতার কথা বলেছেন। যেমন একদিকে ব্রিটিশ সাহিত্য ও প্রেসে সতী প্রথাকে নিন্দা করা হচ্ছে অন্যদিকে আবার আদর্শায়িত করেও দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরনে সতীকে দু ভাবে দেখা হয়েছে। প্রথমতঃ একজন বিধবা যাকে ভুল বুঝিয়ে নেশাগ্রস্ত করে জোর করে চিতায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং দ্বিতীয়তঃ দেখানো হচ্ছে যে একজন বিধবা যিনি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায়, নিজের সিদ্ধান্ত ও বিচক্ষণতায় চিতায় প্রবেশ করছেন।**(১৮)** অর্থাৎ একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির বর্বর দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা অন্যদিকে সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাই ব্রিটিশ মহিলাদের কে স্বামীর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার বার্তা পৌছে দেওয়া।

ইউরোপীয় পর্যটকদের কাছে সতী ছিল, ধর্মীয় উন্মাদনার নামে ভারতীয় নারীর এক নিষ্ঠুর হত্যা। যেখানে নৈতিকতা, সাধারন বিচার বোধের কোনো স্থান ছিলনা। ইউরোপীয়ানরা বিস্ময় প্রকাশ করতেন এটা ভেবে যে, যে হিন্দু পুরোহিত ধর্মের দোহাই দিয়ে গরু হত্যা পাপ বলে মনে করতেন তারাই আবার নিরীহ মহিলাদের নিষ্ঠুর হত্যা লীলায় মেতে উঠতেন। সেজন্যই ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে সভ্য করার জন্য এদেশে তাদের উপস্থিতির ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইংরেজরা ক্রমশ হিন্দু শাস্ত্রে ও সংস্কৃত পুস্তকে এ বিষয়ে কি নির্দেশ আছে তা বুঝতে চেষ্টা করেন প্রাচ্যবাদীদের সাহায্যে। বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টার পর ব্রিটিশরা রামমোহনের মতো সংস্কারকের ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এই প্রথা রদ করতে আইন নিরূপন করতে সক্ষম হন।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ হওয়ার পর বিধবাদের জন্য নির্দেশিত হয়েছিল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন। নারী মুক্তি আন্দোলনে বিধবা বিবাহ প্রচলন ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংসারে বিধবার যন্ত্রনা থেকে মুক্তিদানের জন্য বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেন সংস্কারকগন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবিরা প্রেস ও মঞ্চ ব্যবহার করে এর সমর্থনে প্রচার চালাতে থাকেন। তারা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে শ্রাস্ত্রের বৈধতার কথা উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর এ ক্ষেত্রে খুব বড় ভুমিকা নেন। বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল আদর্শ ও বাস্তব ক্ষেত্রে সমানভাবে ক্রিয়াশীল। মনে করা হয় বিদ্যাসাগর শ্রাস্ত্রে উল্লেখিত বহু গোঁড়া যুক্তিকে বদলে ফেলেন শ্রাস্ত্রের উপর তার পান্ডিত্যের কারনে। বিদ্যাসাগর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে নয় বরং সামাজিক অসাম্যর বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।**(১৯)**

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের জন্য সরকারকে একটি পিটিশন দেন। তিনি মনে করতেন, সমস্ত সামাজিক সমস্যাকে দূরীভুত করা সরকারের কর্তব্য। প্রথম দিকে ইংরেজরা সতীপ্রথার মতো গুরুত্ব দিয়ে বিধবা বিবাহকে দেখেননি। তারা এটা সমাজের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালুর পক্ষে প্রচার করলেও অপর বহু শিক্ষিত বাঙালি এর বিরোধিতা করেন। যেমন ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি রচনা করেন 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ' যেখানে বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিরোধিতা করা হয়েছিল। আরো অনেকে ভূদেবকে অনুসরণ করেন। তবে ১৮৫৬ সালে আইন চালু করে সরকার জনমতকে বোঝাতে পেরেছিল যে এই আইনটি শ্রাস্ত্রের নিয়ম ও ধারা অনুযায়ী গঠিত হয়েছে।

পুরুষ সংস্কারকরা মহিলাদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারন আধুনিক সমাজ গঠনে এটা বাধা স্বরূপ ছিল।উনিশ শতকে নারী শিক্ষা নিয়ে প্রবল বিতর্ক ও দ্বিধা দন্ধ ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নারী শিক্ষাকে শ্রাস্ত্র বিরোধী বলে মনে করত। ১৮৮২-১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিশন সমস্ত পর্যালোচনা করে এদেশে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।তাদের মতে কিছু কিছু প্রদেশে স্থানীয় সংস্থাগুলি নারীশিক্ষায় উৎসাহ দেয়না, অর্থ ব্যয় করেনা। নারী শিক্ষা নিয়ে জনসাধারনের মধ্যে কুসংস্কারও লক্ষ্য করে কমিশন। **(২০)** মিশনারীরা ভারতীয়দের নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতি চেয়েছিলেন এবং তাদের লক্ষ্য ছিল বালিকাদের শিক্ষা দান করা। শিক্ষিত পুরুষরাও জেনানা শিক্ষাকে সমর্থন করতেন কারণ এতে মহিলাদের বাইরের জগতে যেতে হতনা। এই সময় সংস্কারকদের মূল সমস্যা ছিল অন্তপুর ও বাহিরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে আধুনিকীকরন করা। যেখানে মহিলা তার ঐতিহ্য রক্ষা

করে সামাজিক স্তরে উন্নীত হবে। বামাবোধিনী পত্রিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ১৮৬২ সালে কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্ম বন্ধু সভা চালু করেন। যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করা।ঠিক ঐ সময় যখন মহিলাদের পুরুষ মহলে আগমন নিষিদ্ধ ছিল। যখন খুব সামান্য কিছু উচ্চবিত্ত মহিলারা সামান্য কিছু চিঠি পত্র লিখতেন, এবং যখন খুব অল্প পরিমানে বালিকা ও মহিলা বিদ্যালয়ের দেখা মেলে ঠিক সেই সময়েই ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তপুর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যা অন্তঃপুরেই মহিলাদের শিক্ষাদান করবে। এখানে সবাই হবেন মহিলা ছাত্রী এবং শিক্ষক হবেন পিতা, ভাই, স্বামীরা যারা নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী পড়াশুনার নিদেশ দেবেন ও নিদিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা নেবেন। এই ধরনের বিদ্যালয় কলকাতা ও ঢাকায় গড়ে উঠেছিল।**(২১)**

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে মহিলাদের স্বাধীনতা ও নারী শিক্ষার স্বপক্ষে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে লেখালেখি হতে থাকে। ঠাকুর বাড়ী এক্ষেত্রে সক্রিয় ভুমিকা নেয়। মহিলাদের মুক্তির জন্য এই সময় বাংলায় বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন ১৮৬৩ সালে ব্রাহ্মসমাজের তরুন তুর্কী উমেশ চন্দ্র দত্ত ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে স্থাপিত হয় বামাবোধিনী সভা। **(২২)** এই সভার মুখপত্র বামাবোধিনী পত্রিকাই প্রথম বাঙালি নারীর লেখা প্রকাশ করে। প্রায় ১৯ টি সংগঠন ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করে।এর মধ্যে অন্যতম হলো ভারত আশ্রয় (১৮৭২),মহিলা শিল্প সমিতি (১৯০৭), নারী শিক্ষা সমিতি (১৯১৭)। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙলায় বহু পত্র পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে যেখানে নারী কেন্দ্রীক বিষয়গুলি স্থান পেতে থাকে।**(২৩)**

সংস্কারকদের নারীশিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার পশ্চাতে দুটি দিক ছিল। প্রথমতঃ উন্নত পশ্চিমী সভ্যতার সংগে তুলনায় এদেশের সাংস্কৃতিক নৈতিক দুর্বলতার বিষয়টি। এটা বিশ্বাস করা হত যে নারী শিক্ষা মহিলাদের সনাতনী মুল্যবোধ রক্ষায় ও ঐতিহ্যের ক্ষয় হওয়াকে নিয়ন্ত্রন করবে। দ্বিতীয়তঃ পুরুষদের লক্ষ্য ছিল নারীদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষিত পুরুষের আদর্শ স্ত্রী, মাতা হিসাবে গড়ে তোলা। পুরুষরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চায়নি যা মহিলাদের ব্যাক্তি সত্ত্বা তৈরি করবে এবং উন্নত মানুষ হতে সাহায্য করবে। তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা বেড়া হিসাবে গ্রহন করেছিল যেটি ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতীয়দের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত করবে।

সনাতন হিন্দুধর্মে নারীর শিক্ষালাভ করাকে বিপজ্জনক ও বেঠিক বলে মনে করা হত।এমনকি মহিলাদের মধ্যে এমন কুসংস্কারও ছিল যে, শিক্ষা তার জীবনে বৈধব্য ডেকে আনতে পারে।**(২৪)** মনে করা হত মহিলাদের শিক্ষা তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাবে। ফলে সেইস্থানে পারিশ্রমিক দিয়ে একজন পরিচারিকা রাখতে হবে। ফলে ১৮

শতকের মধ্যভাগে বাঙালি পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হতনা। যেখানে একজন ছেলে শিক্ষা শেষে তার কাজ খোঁজার সুবিধে পেত সেখানে একজন মেয়ে তার স্বামী খুঁজে নেবার ক্ষেত্রে অক্ষম ছিলেন ফলে তাকে নির্ভর করতে হত তার অভিভাবকের উপর।**(২৫)** উনিশ শতকের শেষদিকে লেডিস মিশনারী সোসাইটি ব্রিটিশ মিশনারী মহিলাদের নিয়োগ করেন জেনানায় আবদ্ধ মহিলাদের শিক্ষার জন্য। যেখানে ভারতীয় পুরুষরা ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিদেশী শাসকদের সংস্পর্শে এসেছিল, সেখানে ভারতীয় মহিলাদের পশ্চিমী প্রভাব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল সনাতনী আচার ব্যবহারের মাধ্যমে যেগুলি নারী শিক্ষায় বাধা দিয়েছিল এবং নারীকে গৃহ মধ্যে জেনানায় বদ্ধ করে রেখেছিল। ১৮৫৭ সালের আগে অবধি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাগুলি খুব শক্তিশালী ছিল কিন্তু এরপর থেকে শিক্ষিত উচ্চবিত্তরা মহিলাদের পশ্চিম সম্পর্কে জ্ঞাত করার ব্যাপারে আগ্রহী হতে থাকে। মিশনারী মহিলারাও জেনানায় আবদ্ধ মহিলাদের শিক্ষার জন্য এই সময় এগিয়ে আসেন।**(২৬)**

১৯ শতকের শুরুর দিকে পুরুষ ও মহিলার শিক্ষিতের হার খুবই কম ছিল। ১৮৫০ এর পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যখন ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন যেমন ব্রাহ্ম সমাজ, নারী শিক্ষাকে সমর্থন জানায়। তবে এ সময় পুরুষদের শিক্ষাকে যেমন একটা অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ন পর্যায় বলে মনে করা হত নারী শিক্ষাকে দেখা হত শুধুমাত্র সামাজিক সংস্কার সাধনের পথ হিসাবে।**(২৭)** পার্থ চ্যাটার্জী যুক্তি দিয়েছেন যে, উনিশ শতকে নারী শিক্ষার বেড়ে ওঠা চাহিদার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কারন হলো বাংলায় শিক্ষা দেবার উপাদান ও শিক্ষামূলক সাহিত্য। কারন এগুলি ছিল আধ্যাত্মিক ও আদর্শগত দিক থেকে হিন্দু সমাজের কাছে গ্রহনীয়, তুলনায় সন্দেহজনক খ্রীস্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি থেকে।**(২৮)** যা কিছু স্থায়ী, বিশুদ্ধ এবং আধ্যাত্মিক তাকেই নারীর সংগে চিহ্নিত করা হত। তাই ইংরেজি পদ্ধতিতে বালিকা ও মহিলাদের যে শিক্ষাদান করা হত সেটাকে মনে করা হত বিজাতীয়করন।(**২৯)** দীপেশ চক্রবর্তী লক্ষী ও অলক্ষীর কথা বলেছেন যেখানে লক্ষী হলেন ত্যাগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। আর অলক্ষী হল এর বিপরীত। এছাড়া এটাও মনে করা হত যে ঠিক মতো বাড়ীর কাজ না করলে বা পারিবারিক আচাড় অনুষ্ঠান যদি মেয়েরা ঠিক মতো মেনে না চলে তবে পরিবারের ক্ষতি হবে বা ধ্বংস হতে পারে। এমনকি মেয়েরাও এমন মনে করতেন।**(৩০)** ১৮৬০ নাগাদ বহু বাঙালি সাহিত্যিক মনে করতেন যে বাঙালি নারীর মধ্যে অলসতা, ও সাধারন নিষ্ঠুর মনোভাবের জন্য অর্থাৎ অ-লক্ষী প্রকৃতির জন্য দায়ী ছিল শিক্ষার অভাব। কখনো আবার শিক্ষাকে অ-লক্ষী স্বভাবের জন্য দায়ী বলে মনে করা হত। যেমন ভূল শিক্ষা

পদ্ধতির ফলে শুধু অলসই নয়, লজ্জাহীন, উদ্ধত, স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ এবং সন্তানের প্রতি অবহেলাপূর্ণ আচড়ন দেখা দেবে।(৩১)

রক্ষণশীল বাঙালি সমাজ বাল্য বিবাহ কে জোরদার সমর্থন করত। ১৮৯০ সালে ১১ বছরের ফুলমনি স্বামীর সঙ্গে সহবাসের ফলে মারা গেলে ১৮৯১ সালে age of consent বিল বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক ওঠে। ভারতীয় সংস্কারকরা ঔপনিবেশিক সরকারকে age of consent এর জন্য মেয়েদের বয়স ১২ করার জন্য দাবী জানায়। কিন্তু গোঁড়া হিন্দু ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদীরা age of consent এর বিরোধিতা করেন। তাদের যুক্তি হলো এটি গর্ভধারনের মৌলিক জীবন চক্রকে অমান্য করছে, যেখানে একজন বালিকা বাধ্য তার স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে।(৩২) এই আইনের বিরূদ্ধে প্রবল জনমত তৈরি হয়।আইনটি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য হয়। কলকাতার সঙ্গে ঢাকায় এই বিলটির বিরূদ্ধে প্রবল আন্দোলন গঠিত হয়।(৩৩) অর্থাৎ 'স্ত্রীর ওপরে স্বামীর দাম্পত্য অধিকারকে সংযত করার চেষ্টা করে প্রস্তাবিত সংস্কার এদেশীয় পৌরুষত্বের একমাত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রটিকে আক্রমন করে। শিশু নববধূ হিন্দুদের গৌরবের প্রতীক হয়ে ওঠে।'(৩৪)

ভারতীয় সংস্কারকরা পাশ্চাত্যের আধুনিক ধ্যানধারণাকে গ্রহন করার তাগিদেই দেশীয় সমাজ ও ধর্মীয় আচার ব্যাবহারের সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। তবে সেই সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্য কে রক্ষা করার চেষ্টাও সমান ক্রিয়াশীল ছিল। তাদের মননে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে একটা ধারনাও গড়ে উঠেছিল। সংস্কারকরা পরিবারের গন্ডির মধ্যেই নারীর সমস্যাকে দেখতে চেয়েছিলেন। নারী ছিলেন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধি। যে পাশ্চাত্যের প্রভাবে কোনোভাবেই পরিবর্তিত হয়নি। ঘর ছিল ভারতীয়দের নিজস্ব এলাকা, সেখানে ঔপনিবেশিকতার কোনো প্রভাব প্রবেশ করেনি এবং নারী সেই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কে সযত্নে লালন পালন করবে। ফলে সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার কার্যের মধ্যে এই মনোভাবটি সমস্ত উনিশ শতকে দেখা গিয়েছিল। এক ধরনের দোদুল্যমানতা ভারতীয় পুরুষ সমাজের মনে ক্রিয়াশীল ছিল। নারীর স্বাধীনতা চাই- কিন্তু তা হবে দেশীয় সমাজের সঙ্গে মানাসই এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব বর্জিত। নারী এব্য পুরুষ সমান ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিকতার স্পর্শ পায়নি। অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতি, সভ্যতার রক্ষাকারী রূপে সব সময় নারীকেই ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সামাজিক পরিস্থিতিও এমন ছিল যে নারীরাও তাদের বেঁধে দেওয়া গন্ডির

বাইরে যেতে সাহস পেতেন না। এই সময় যে সমস্ত মহিলারা লেখালেখি, চিন্তাভাবনা করতেন তাদের মধ্যে প্রবল আত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা যেত যে সেই আত্মবোধকে প্রশমিত করে বিভিন্ন সামাজিক চাহিদাগুলোকে পুরণ করার আপ্রান চেষ্টা।

আধুনিক পাশ্চাত্য চেতনা সমাজের ভেতরে প্রবেশ করুক এটা বাঙালিরা কিছুতেই চাইতেন নাা। কারণ পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে পুরানো মূল্যবোধ, জাতিগত বৈষম্যের নিদর্শনগুলি এক এক করে ভেঙে পড়ছিল। তারা পুরানো ধর্মীয় আচার ব্যবহার, ব্রাহ্মন্য ধর্মের প্রভাব বজায় রাখতে চেয়েছিল। ফলে নারীর অবস্থান ছিল প্রান্তিক। নারীর অবস্থা উন্নত করার চেষ্টাও ছিল তাই ক্ষীণ।

References:

(1). Partha Chatterjee, Colonialism, *Nationalism, and Colonialized Women: The Contest in India*, American Ethnologist, Vol-16, No-4, Nov.1989, p.623-625

(2). Partha Chatterjee, *The Nationalist Resolution of the Women's Question*, in K. Sangari and S. Vaid (Ed), Recasting Women: Eassays in Colonial History, New Delhi, 1989,p. 237-239

(3). শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশী থেকে পার্টিশান,* ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬, পৃ. ৪৪৮

(4). Partha Chatterjee, *Colonialism, Nationalism, and Colonialized Women: The Contest in India*, American Ethnologist, Vol-16, No-4, Nov.1989, p.622

(5). Dipesh Chakrabarty, *The Difference: Deferral of (A) Colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British Bengal*, History Work Shop, Oxford Journal, OUP, No-36, *Colonial and Post Colonial History* (Autumn), 1993,p. 54

(6). Edward Said, *Orientalism*, New York, Vintage Books, 1979, p.78

(7). Partha Chatterjee, *Colonialism, Nationalism, and Colonialized Women: The Contest in India*, American Ethnologist, Vol-16, No-4, Nov.1989, p.622-623

(8). Romila Thapar, *Looking back in History*, in D. Jain Ed, Indian Women, New Delhi, Publication Division, *Ministry of Information and Broadcasting*, Govt of India, 1975, p.7

(9). শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশী থেকে পার্টিশান,ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬, পৃ. ১৯৩

(10). Tapan Ray Chaudhuri, *Perceptions, Emotion, Sensibilities, Essays on India's Colonial and Post Colonial Experiences*, New Delhi, OUP,1999,p.8

(11). Lata Mani, *Contentious Tradition:The Debate on Sati in Colonial India,* Cultural Critique, No.7, The Nature and Context of Minority Discourse II, University of Minnesota Press,Autumn, 1987,p.125

(12). Ibid

(13). Sophie Gilmartin, *The Sati, the Bride, and the Widow: Sacrificial Women in the Nineteenth Century*, Victorian Literature and Culture, Vol. 25, No. , Cambridge University Press, 1997, p. 142

(14). Lata Mani, Ibid, 1987, p.136

(15). Sumit Sarkar, *Orientalism revisited: Saidian fram works in the Writing of modern Indian history*, in Mapping Subaltern studies and the Post Colonial, ed, V, Chaturvedi, London, New York, Verso, 2000, p.248

(16). Jasodhara Bagchi, *Socialising the Girl Child in Colonial Bengal*, EPW, Vol-28, No-41, Oct. 9, 1993, p. 214

(17). Sophie Gilmartin, Ibid, 1997, p.142

(18). Ibid

(19). Amalesh Tripathi, *Vidyasagar: The Traditional Modernizer*, Calcutta, Punascha, 1998, p, 85

(20). আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী* (১৮৭৩-১৯৮৭) প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৬৬, ৬৭

(21). Krishna Sen, *Lessons in Self-Fashioning: Bamabodhini Patrika and the Education of Women in Colonial Bengal*, Victorian Periodicals Review, Vol-37, No-2, 2004p. 177

(22). Ibid

(23). আনোয়ার হোসেন, ২০০৬, পৃ. ৪৫, ৪৬,১৫৬

(24). Geraldine Forbes, *The New Cambridge History of India*, IV-2, Women in Modern India, Cambridge, 1996, p. 33

(25). Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal: 1849-1905*, Princeton, 1984, p. 61

(26). Geraldine Forbes, "In Search of the 'Pure Heathen' Missionary Women in Nineteenth Century India", *EPW*, Vol-21, No-17, April 26, 1986, p. 2

(27). Geraldine Forbes, 1996, p. 41

(28). Partha Chatterjee, *The Nationalist Resolution of the Women's Question*, in K. Sangari and S. Vaid (Ed), Recasting Women: Eassays in Colonial History, New Delhi, 1989, p. 245

(29). Meredith Borthwick, 1984, p. 91

(30). Dipesh Chakrabarty, *The Difference: Deferral of (A) Colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British Bengal*, History Work Shop, Oxford Journal, OUP, No-36, Colonial and Post Colonial History (Autumn), 1993,p. 54

(31). Ibid, p.61

(32). Tanika Sarkar, *A Prehistory of Rights: The Age of Consent Debate in Colonial Bengal*, Feminist Studies, Vol-26, N0-3, autumn, 2000, p. 601

(33). আনোয়ার হোসেন, ২০০৬, পৃ. ২৯

(34). শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৬, পৃ. ৪৪৮